মঞ্চ সংবাদ

নভেম্বর, ১৯৯৪ ● সংখ্যা ২০

☐ কানোরিয়া ঃ ভাঙ্গণ না নির্মাণ ? ৩

☐ মেগাসিটি প্রোগ্রাম ৭

☐ 'রাজেশ্বর রাই' দিবস পালন ৯

☐ কারখানা সংবাদ ১০

অ্যামকো ঃ বন্ধ কারখানার জমিতে সরকারি আবাসন

কারখানাকে রুগ্ন করে বেচে দেওয়া বা পুনরুজ্জীবনের নামে সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের থেকে রেহাই নেওয়া একটা লাভজনক প্রক্রিয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা বোর্ড অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ফিনান্সিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন একথা স্বীকার করেছে। তেমনই আরও একটা লাভজনক ব্যবসা হল বন্ধ কারখানাকে অধিগ্রহণ করে তার জমি বেচে দেওয়া। সেই জমিকে কারখানার স্বার্থে নয় এমন কাজে বিশেষতঃ আবাসন তৈরীর জন্য বেচে দেওয়া। আইন আছে, কারখানার জমি কেবল কারখানার স্বার্থেই বেচা হবে। কিন্তু তাতে আর যাই হোক প্রোমোটার লবির স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না। তাই আইন, প্রথা, এমনকি আদালতের নির্দেশ — সবই ধামাচাপা হয়ে যায়। দমদমের অ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর (অ্যামকো) সরকারি জমি পুনরায় সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ এ কথাই মনে করায়। এবছর ১৬ জুন রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি সুভাষচন্দ্র পাহাড়ীর স্বাক্ষরিত এক আদেশে (নং ৮৩২/এল-রেফা) এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট-এর ২ ? ধারায় অ্যামকো কারখানার ১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অ্যামকোর শ্রমিকরা এ নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন সুভাষবাবুর সঙ্গে। সুভাষবাবু বলেছেন, যেহেতু সরকার নিজেরই জমি অধিগ্রহণ করেছে, তাই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নই নেই।

কারখানার জমিতে এই আবাসন চক্রের বিষয়ে আসার আগে অ্যামকোর বিষয়ে কিছু বলা দরকার। ১৯২২ সালে গঠিত এই কারখানার তৈরী মাল 'ক্রাউন ব্র্যাণ্ড' হিসেবে বাজারে সুনামের সঙ্গে চলতো। ২নং যশোর রোডের এই কারখানা ১৯৮৪ সালে যখন বন্ধ হয়, তখন এতে কাজ করতেন ১,১০০ শ্রমিক। পাওনা আদায়ে ব্যাঙ্কগুলো এবং আই আর বি আই ১৯৮৬-তে হাইকোর্টে যায়। ১৯৮৭-র ১ জুলাই বিচারপতি মঞ্জুলা বসু অন্য কয়েকজন আগ্রহী ক্রেতার প্রস্তাবিত দাম বেশি থাকা সত্ত্বেও মাত্র দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে এই কোম্পানী ওরিয়েন্টাল সেলস এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি মঞ্জুলা বসু বলেন ঃ

"আদালতের কাছে এটা স্পষ্ট যে উপস্থিত ক্রেতাদের মধ্যে আদালত তাকেই (এই কারখানা) দিচ্ছে, যিনি বেশির ভাগ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে কারখানা চালু করবেন এবং কারখানা তুলে দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে কিছুটা বা পুরোটা ভেঙেচুরে কিছু করবেন না।"

এই কারখানা কেনার আদালতের আদেশ হওয়ার ১৫ দিন আগেই অর্থাৎ ১৯৮৭-র ১৬ জুন ওরিয়েন্টাল সেলস এজেন্সির মালিক 'বিখ্যাত' অনুপ ধর-এর সঙ্গে চুক্তি হয় অ্যামকো-র জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির। তাতে শর্ত ছিল, ১৯৮৪তে বন্ধের সময়ে পে রোলে থাকা শ্রমিকরা কাজ ফিরে পাবেন। আদালতের নির্দেশ ছিল বিনা অনুমতিতে প্ল্যান্ট বা মেশিনারি বিক্রি বা রদবদল করা যাবেনা। কারখানার মালিকানা পাওয়ার পর অ্যামকোতে বিজয় উৎসব হল। এলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক, এলেন যুব-কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, আই এন টি ইউ সি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লালবাহাদুর সিং, সিটুর নেতা অজিত চৌধুরি সবাই ছিলেন। ওরিয়েন্টাল সেলস-এর মালিক অনুপ ধর বললেন 'কারখানা খুলবে', মন্ত্রীরা বললেন, 'কারখানা খুলবে। শ্রমিকরা কাজ ফিরে পাবে।' সরকারি দলের রাজনৈতিক মুখপত্র 'গণশক্তি'তে এখবর ছাপাও হল। কিন্তু কারখানা কোনোদিনই খুলল না। শ্রমিকরা ফিরে পেলেন না কাজ। আদালতের নির্দেশে আপত্তি থাকলেও কারখানার সমস্ত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি খুলে খুলে বিক্রি করে দিলেন মালিক অনুপ ধর। পড়ে রইল একটি শেডের খাঁচা আর খালি জমি। এখন সরকার কফিনের শেষ পেরেকটা গেঁথে দিলেন বিনা ক্ষতিপূরণে কারখানার জমিটুকুও অধিগ্রহণ করে। বাকী রইল খাঁচাটুকু। আদালতের নির্দেশে যাদের স্বার্থরক্ষার কথা ছিল, সেই শ্রমিকরাই শুধু টাকা পয়সা, চাকরি কিছুই পেলেন না।

বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা অ্যামকো সংহতি কমিটির মাধ্যমে ১৯৮৯

সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আদালতের দারস্থ হয়েছিলেন। জমিটুকুও কেড়ে নিতে অবশ্য তার জন্য সরকারের বিবেকে বাধেনি। এক হাজার শ্রমিক তাদের আধমরা শরীর নিয়ে রয়ে গেলেন। এদের রক্ষার ভার যাদের ওপর, তারা নিজের নিজের ভাগটুকু বুঝে নিলেন। দেড় কোটি টাকার কারখানা কিনে অনেক বেশিই বুঝে নিলেন 'মালিক' অনুপ ধর।

সরকার যে জমি নিয়েছে এই জমি তাদেরই ছিল। অ্যামকোর মত আরও বেশ কিছু কারখানার জমি ওই একই আইন বলে সরকার অধিগ্রহণ করেছে সম্প্রতি। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্থান টেক্সটাইলস, মোটর মেশিনারীর জমি। ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে অন্তর্তদন্ত করা হয়েছে কলকাতা ও তার আশেপাশের এরকম ৩০০ কারখানার জমি নিয়ে। এদের মধ্যে এরকম অনেক কারখানাই আদালতের রায়ে হাত বদল হলেও রুগ্ন, বন্ধ। জমি সরকারি বা খাস হলে ক্ষতিপুরণ দেওয়াও হচ্ছে না।

এসব জমিতে তৈরী হচ্ছে বা হবে আবাসন। কোথাও সরকারি আবাসন, কোথাও প্রোমোটারের আবাসন। মেগাসিটির জন্যেও প্রচুর জমি দরকার। অতএব প্রয়োজনে কারখানার জমিই নেবে সরকার। স্থপতি ও নগর-রূপকাররা যতই বলুন যে অধিক বসতি বাড়লে কলকাতা বসে যেতে পারে অথবা বসতি বৃদ্ধি নাগরিক জঙ্গল তৈরী করবে—কোনো পরোয়াই নেই কর্তাদের। ইতিমধ্যে বন্ধ কারখানা তুলে দিয়ে আবাসন তৈরী হয়েছে কোন্নগরের কানোরিয়া জুট মিলে। এটি সরকারি আবাসন। আগরপাড়ার দীপ্তি হারিকেন কোম্পানী ওরিয়েন্টাল মেটালের জমিতে তৈরী হয়েছে বেসরকারি প্রোমোটারের আবাসন। সোদপুরের বঙ্গোদয় কটন মিলের জমিতে কারখানা তুলে দিয়ে তৈরী হয়েছে পিয়ারলেস আবাসন। আর, অ্যামকোর শ্রমিকদের মতো এই সব কারখানার শ্রমিকরাও তাঁদের চাকরি হারিয়ে ক্ষয়কাশে আর অনাহারে আধমরা শরীর নিয়ে ধুঁকছেন। জমি চলে যাচ্ছে উৎপাদনীক্ষেত্র থেকে আবাসনে।

মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটির খবর

গত ৬ অক্টোবর মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটির সভায় প্রস্তুতি কমিটির খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে সভার তারিখ ও সময় ঠিক করা হয়।

২২ অক্টোবর '৯৪ : নাগরিক মঞ্চের অফিসে, বিকেল পাঁচটা।

২৭ " : দমদম অঞ্চলের সভা কমলাপুর হাইস্কুলে, সন্ধ্যে সাড়ে ছটা।

২৮ " : হাওড়া অঞ্চলের সভা ইন্দো-জাপান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের অফিসে, বিকেল পাঁচটা।

৩০ " : বরানগর অঞ্চলের সভা বরানগর জুট মিল মজদুর কমিটির অফিসে, বিকেল তিনটে।

৩১ " : কলকাতা অঞ্চলের সভা আবাসন পর্ষদের অফিসে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

৪ নভেম্বর : হুগলী অঞ্চলের সভা শ্রীরামপুরে বরুণ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে, বিকেল তিনটে।

অন্যান্য অঞ্চলের সভার তারিখ পরে ঠিক হবে।

২২ অক্টোবর '৯৪-এর সভায় সাংগঠনিক কনভেনশনের তারিখ ঠিক হয়েছে আগামী ৪ ডিসেম্বর '৯৪, বিকেল তিনটেয়, জর্জভবনে।

প্রস্তুতি কমিটির আগামী সভা ১৪ নভেম্বর '৯৪ দুপুর দুটোয়, নাগরিক মঞ্চের অফিসে।

কানোরিয়া ঃ ভাঙনের হাতিয়ার না নির্মাণের ইতিহাস ?

অনেকদিন পরে পশ্চিমবঙ্গে আবার একটা আন্দোলন দল বা মতবাদের গণ্ডীকে অতিক্রম করে নানান মানুষের সমর্থন, অংশগ্রহণ ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের শুরু কানোরিয়ার শ্রমিকদের কারখানা খোলার দাবীতে ও শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি মিলের অন্য ইউনিয়নগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলন চলতে চলতেই সরকার-স্বীকৃত শ্রম আইন ও শিল্প-সম্পর্কের যথাযথ আইনসম্মত প্রয়োগের দাবীও সংগ্রামী শ্রমিকরা করতে থাকলেন। তাঁদের দাবীকে কেন্দ্র করে যে সব কর্মসূচি তাঁরা নিলেন তাতে যেমন একদিকে অভিনবত্ব ছিল, অন্যদিকে শ্রমিকদের লড়াকু মনোভাব সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে আন্দোলনটির সমর্থক করে তুলল। দাবী সমাবেশগুলোতে ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি ঘটতে থাকল। তারপর যা যা ঘটেছে সর্বশেষ ২৮ সেপ্টেম্বর '৯৪-এর চুক্তি ও পরবর্তী পরিস্থিতির রোজনামচা, ওয়াকিবহাল মানুষ ও সংবাদপত্রের পাঠক সবারই জানা। যে আন্দোলন সমাজের নানান অংশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবে তার কিছু সামাজিক দায় এবং দায়িত্বও থেকেই যায়। তাই শুরু হয়েছে এবার নানান দিক দিয়ে জবাবদিহি, কৈফিয়ৎ, বাদানুবাদ, জিজ্ঞাসার পালা। এই আন্দোলন দিশাহীন, নরমপন্থী, আপোষপন্থী ইত্যাদি নানান অভিযোগ যেমন আছে, সংগ্রামী শ্রমিকদের নেতৃত্বের তরফে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারা এবং আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা তথা শ্রমিকদের বর্তমান সংগ্রামের অবস্থানজনিত ক্ষমতা ও একটা বন্ধ কারখানা খোলার লড়াই—পাশাপাশি, জুট মালিক তথা কিছু অসাধু শিল্পপতিদের শিল্পবিরোধী ও শ্রমিকবিরোধী ভূমিকার প্রমাণ দেওয়া—এর চেয়ে বেশী কিছু এই আন্দোলনের দাবী ছিল না বলে জবাবদিহি আছে। গণ্ডগোলটা এখানেই। কারখানা দখল, যৌথ রান্নাঘর, মালিকের চরিত্র বদলানোর হুঙ্কার কিংবা বিকল্প দেওয়ার লড়াই—নানান সময়ে দাবীর মাত্রা একটু চড়া হয়ে গিয়েছিল। সমস্যা ছিল। একটা বন্ধ কারখানার শ্রমিক শুধুমাত্র যদি নিজের কারখানার জন্য লড়াই করে তবে সমাজের অন্য অংশের বা অন্য কারখানার মানুষ সমর্থন করবে কেন? খুললে তো শ্রমিক মজুরী ফিরে পাবে, তবু কেন এবং কিসের জন্য সমর্থন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন সমাজের নানান অংশের শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্তের কাছে ভালবাসা ও অর্থ দেওয়ার দাবী ওঠে তখন এই আন্দোলন যে শুধুমাত্র একটা বন্ধ কারখানার আন্দোলন নয়—তা সমাজের স্থপতি বিশ্বকর্মার অস্তিত্বের সংকট, এমন একটা বোধ সংগ্রাম কিংবা সংহতির ঘাড়ে চেপে বসে। দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত আইনী তথা সামাজিক অধিকারগুলো থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। এই অন্যায়, অবিচার ঘটে চলছিল অনেকদিন ধরে, আজও তা ঘটে চলেছে। তবু সংশ্লিষ্ট মানুষজন ছাড়া আর কেউই তার খবর রাখত না। তাদের কাছে এই পর্দাটা সরে যায়, অনেক অজানা তথ্যই এই সুযোগে লোকচক্ষুর সামনে চলে আসে। সমর্থক মানুষ আন্দোলনটাকে নিজের করে নেয়, সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মানুষেরা সহমর্মী হয়ে ওঠে, সমর্থক হয়ে ওঠে। যে কোনো সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বিক্ষোভের জন্য সংগ্রামের এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। অনেক কারখানা রোজ বন্ধ হয়, বেশ কিছু কারখানা রোজ খোলে, কিছু কারখানা কবরখানায় পরিণত হয়। কোথাও আছে বিক্ষোভ, ধর্ণা, মিছিল, অবরোধ। কোথাও আছে কালো চুক্তি, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আপোষ, দালালি, আছে নানান রং-এর সরকারের শ্রমিককে কর্মচ্যুত করার চক্রান্ত, আইনসম্মত অধিকার কেড়ে নেওয়ার মালিকী ষড়যন্ত্র। এসব অসংখ্য হাজারে হাজারে আছে সারা দেশে যেমনি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও আছে। কানোরিয়া শ্রমিকদের বিদ্রোহের জন্ম হয়েছে এমনই কিছু পরিস্থিতির গর্ভ থেকে। এটা দেখে এবং জেনে অনেকেরই মনে হয়েছে, কানোরিয়ার সংগ্রামী শ্রমিকদের সাহস আছে, দাবীকে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ়তা আছে, বিলুপ্ত অধিকারগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা আছে।

সহমর্মিতা, সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এলেন যে মানুষরা, অতীতে তাঁরা অনেক শপথের মৃত্যু দেখেছেন। তাই এই আন্দোলন যখন সীমাবদ্ধতার কথা বলল, শুধুমাত্র একটা কারখানা কোনোরকমে খোলার মধ্যেই ফিরে গেল, অনেক সন্দেহ-অবিশ্বাস নিয়েও যখন চুক্তিতে সই করল, তখন অভিযোগ এল আপোষের, আত্মসমর্পণের।

অনেক দুঃস্বপ্ন আমাদের অভিজ্ঞতা। তবু একদল সমর্থক, সহমর্মী, সহযোগী, সক্রিয় কর্মী আজও স্বপ্ন দেখেন। কোথাও কোনো আন্দোলনে সেই স্বপ্নকে ছিনিয়ে আনার ইঙ্গিত থাকলে তাঁরা সমর্থনে এগিয়ে যান। অনেককাল বাদে এমনই একটা আন্দোলন, কানোরিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল, অনেককেই সমর্থক বানিয়েছিল। সেই সমর্থক, বন্ধু

সহযোগীদের অনেকেই আজ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে মনে করছেন। সংগ্রামী শ্রমিকদের নেতৃত্বের একাংশ যেভাবে স্রেফ কৌশল করার জন্যই, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাচ্ছেন, শ্রমিকদের এবং সমর্থক গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশী অত্যাচার সত্ত্বেও যেভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে একটা দপ্তরের সিদ্ধান্ত বলছেন, বারবার সরকারের নীতি নির্দ্ধারক, মুখ্য প্রশাসক, রাজনীতিক মুখ্যমন্ত্রীকে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাতে প্রশ্ন জাগে সরকারের সমর্থন পাওয়া আন্দোলনে জনগণের সমর্থন কেন চাই? যেখানে এই আন্দোলন একজন মালিকের বিরুদ্ধে, কিংবা সংগ্রামী শ্রমিক নেতৃত্বের কথায়—শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম দপ্তরের বিরুদ্ধে, এরা কি এতেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য কোনো আন্দোলনে এস পি আর ডি এম-এর নেতৃত্বে পুলিশী অত্যাচার হবে, পসারীর মত একজন মালিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না—তার বিরুদ্ধে ৪০৬/৪০৯ ধারায় ভারতীয় দণ্ডবিধি বলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও!

অনেকেরই মনে আছে ১৯৮১ সালে পোল্যাণ্ডের লেচ ওয়ালেসার নেতৃত্বে শ্রমিকদের সমর্থনে সলিডারিটির আন্দোলনের কথা। আমরণ অনশন, অবরোধ, যৌথ রান্নাঘর সবই ছিল। সেদিন অনেক শ্রমিক সংগঠন, এমনকি অনেক দলও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকদের সমর্থনে ছাত্র, যুব, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংহতির ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে সেই নেতা সে দেশে ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু আজ নিশ্চয় এটা অনেকেরই জানা—অনিবার্য ভাঙনের পরিণতি ঘটেছে, স্বপ্ন পুরণের ইতিহাস হয়নি।

শ্রমিক যখন কারখানায় লড়াই করেন তখন সমর্থক মানুষ মনে করেন এরা বাঁচার লড়াই, টিঁকে থাকার লড়াই লড়ছে। শ্রমজীবী মানুষ যখন আইনী অধিকারের জন্য লড়েন—সহমর্মী বন্ধু, সহযোগীরা মনে ভাবেন সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই হচ্ছে। সেই মানুষ যখন সমাজের স্বপ্নের জন্য লড়েন সেই লড়াই তখন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হয়ে যায়। কোনো পেশাদারী দক্ষতার সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য শুধু স্বপ্নের মানুষ অথবা স্বপ্ন কোনোটাই লাগে না।

রুখে দাঁড়ানো কেন?

পশ্চিমবঙ্গে অনেক কারখানাতেই আজ ঘুরে দাঁড়ানো, রুখে দাঁড়ানো মজদুরদের উদ্যোগ গড়ে উঠছে। এই উদ্যোগ বা সংগঠনগুলো গড়ে উঠছে যে পরিবর্তিত অবস্থায় তার কারণ বলা যায়, পুঁজি সবসময় চেয়েছে শ্রমিক শুধু শ্রম দিক, এবং সংগঠিত ইউনিয়নের একটা পর্যায়ে ইউনিয়ন চাইল শ্রমিক শুধু শ্রমের মূল্য নিয়ে ন্যায়সঙ্গত লড়াই করুক। নেতারা চাইলেন, শ্রমিক কারখানা চিনুক আমাদের চোখ দিয়ে, শিল্প জানুক আমরা যখন যেমনটা চাইব সেভাবে অর্থাৎ এগিয়ে বা পেছিয়ে। কারখানার গেট মিটিং-এর মাধ্যমেই শ্রমিকদের কিছু জ্ঞান, কিছু লড়াই, কিছু স্বদেশ বিদেশের কথা। এই অবস্থায় মালিকরা বললেন, শ্রমিকরা ত্যাগ স্বীকার করলে শিল্পের অবস্থাটা পাল্টানো যায়। সরকার বলল অবস্থা পাল্টেছে, অর্থনীতির সংকট কাটিয়ে উঠে তাকে শিল্প বুঝতে হবে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, কারখানার নেতারা বললেন মালিকরা দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে চুরি করে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না করার ফলে, কারখানা ধুঁকছে, বন্ধ হবে। ফলে শিল্পটা বুঝে লড়তে হবে, এখন কিছু ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শ্রমিকরা দেখছেন, যাঁরা বলছেন অর্থাৎ সরকার, মন্ত্রী, নেতা, মালিক তাঁরা কোনো ত্যাগ স্বীকার করছেন না, বরং এদের অবস্থা পাল্টাচ্ছে। পুঁজি চেয়েছিল শ্রমিকদের শিল্প থেকে বিচ্ছিন্নতা বাড়ুক, সে মানুষ নয়, সে রোবোটের মত যন্ত্র চালাক। ইউনিয়নগুলো, বিশেষ করে সমাজ বদলের বিশ্বাসীরা চেয়েছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, শ্রমিকের শিল্প-বিচ্ছিন্নতা পুঁজির বাড়বৃদ্ধি রুখবে। কাজ করলেই উদ্বৃত্ত মূল্য, তাই কাজ কম করলে উদ্বৃত্ত মূল্য কম তৈরী হবে, পুঁজির বৃদ্ধি ঘটবে না, পুঁজির তেজ কমবে। তাতে পুঁজিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যারা চান তাদের এক অর্থে লাভই তো হচ্ছে! তাই প্রথমে ছিল নীতিগতভাবে এটা দেওয়ার চেষ্টা, পরে এটাই সুবিধাবাদে পরিণত হল।

আজকের প্রকল্প-ভিত্তিক ও কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়নগুলোর অনেকে শ্রমিকদের বিশ্বাসকে আবার পুনরুদ্ধার করেছেন, বলা যায়। প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সাইন-বোর্ড ইউনিয়নে পরিণত করে যেসব ঘুরে দাঁড়ানো মজদুররা কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়নে সংখ্যাধিক্য মজদুরদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাঁরা ইতিবাচক অনেকগুলো দিক আজ হাজির করেছেন। অনেককাল পরে মজুরেরা আবার আন্দোলনে ফিরে আসছেন নিজেদের উদ্যোগে। যে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্নতা তাঁদের ঘটে গিয়েছিল, আবার সংগঠন গড়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে তা ফিরে আসছে। এসব সত্ত্বেও বলতে হবে গুরুত্বপূর্ণ একটা নেতিবাচক ধারা রয়ে গেছে। শিল্প জানা এবং বোঝার কিছু প্রয়াস নজরে এলেও সামাজিক বিভিন্ন দাবীর প্রতি সমর্থনে অনীহা আছে, যা গড়ে তুলছে সামাজিক দায়িত্বগুলোর থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা। ঘুরে দাঁড়ানো মজদুরদের যে উদ্যোগ এবং সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের বক্তব্যে লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত অ-মজদুর জনগণের দাবী (যাঁরা সমাজে শ্রমিকদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি)। দেশ চালায় যে সরকার তার আর্থিক নীতি তথা রাজনীতির আধিপত্য, ক্ষমতা এমনই যে শুধু একটা কারখানার শ্রমিক একা একা লড়াই করে এমনকি নিজেদের আর্থিক সুবিধাগুলোই পুরোমাত্রায় আদায় করতে পারবেন না যদি না সমানে সমানে লড়েন। তথ্য ও

সামর্থ্য দুটোই মালিক পক্ষের বেশী তবু তারা ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন ফোরামে। আর মজদুররা যদি ভাবেন একটা কারখানায় ঐক্য গড়ে তুলে আমি আমার অবস্থা কিছুটা পাল্টে দেবো—হয়ত এই পথে হাঁটলে অনেক সত্য জানা যাবে, অনেক সংগঠন উঠে গিয়ে নতুন কিছু সংগঠন হয়ত হবে। তবে অল্প কিছুদিন হাঁটার পরে ক্লান্তি আসবে, হতাশা আসবে, কারখানার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়ার ভিত গড়ে উঠবে, প্রবল প্রতিপক্ষের সন্ত্রাস বাড়বে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এ বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের বোনাস আইনের ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সংগঠিত শ্রমিকদের ৫ লক্ষের মত শ্রমিক বোনাস পেলেন না এবং যাঁরা পেলেন তাঁরা বেশীর ভাগই অর্ধেক মাসের মাইনের চেয়েও কম পেলেন। সারা ভারতের সংখ্যার বিচারে 'শক্তিশালী' শ্রমিক সংগঠন বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোনো আন্দোলন করল না? এত বড় ঘটনা যা জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রমিকদের বোনাস আইন করে কেড়ে নেওয়ার মত ঘটনা ঘটল, তবু প্রতিবাদ আন্দোলনবিহীন রয়ে গেল? কারখানায় ঘুরে দাঁড়ানো মজদুররা ক্ষুব্ধ হলেন, প্রতিবাদও করলেন নিজস্ব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রতিবাদ ঐক্যবদ্ধ হলনা। একদিকে সংগঠিত শ্রমিকবাহিনীর রেজিষ্টিকৃত নেতৃত্ব আন্দোলন চাইলেন না, অন্য দিকে কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়ন এবং প্রকল্প-ভিত্তিক ইউনিয়নগুলোর কারখানা ভিত্তিক এ লড়াই দেশের আইন বদলানোর মত চাপ সৃষ্টি করার ঐক্য অনুপস্থিত থাকার কারণেই, প্রতিবাদহীন রয়ে গেল। লাভ হল মালিকের। মালিক ও সরকারের এই যৌথ আঁতাত অনেক বছরের অর্জিত অধিকার শ্রমিকের কাছ থেকে কেড়ে নিল বিনা প্রতিরোধে, বিনা প্রতিবাদে।

আর এই জন্যেই ঘুরে দাঁড়ানো মজদুরদের আন্দোলন যা দেশজুড়ে আলোচিত, সেই কানোরিয়ার কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়নের আন্দোলনে এমন অনেকের সমর্থন দেখি যাঁরা সরকারি-বে-সরকারি ক্ষমতাবান, যাঁরা প্রকাশ্যে অনেকেই কেন্দ্র বা রাজ্যে নতুন শিল্পনীতির সমর্থক। আন্দোলনে তাই দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, শিল্পপতি, শিল্প পেশাদার সহ অনেক নামী দামী ব্যক্তিকে, যাঁরা এই আন্দোলনকে দেখতে চান কারখানার গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিসেবে, সংগঠিত শ্রমিকদের শ্রেণী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে নয়, কারখানা ভিত্তিক শ্রমিকদের একটা দর কষাকষির মঞ্চ হিসেবে। যেহেতু তাদের ধারণায় এই আন্দোলন কারখানায় প্রেসার গ্রুপ গড়ার প্রচেষ্টা এবং যতক্ষণ এই আন্দোলন ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে পুলিশী অত্যাচারের প্রয়োজন হয়নি। প্রশ্ন, মন্ত্রী ও শিল্পপতিদের সহানুভূতি কি শ্রমিকদের অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াইকে সমর্থন জানাতে? অভিজ্ঞতা কি এমনটা বলে? যাঁদের কাজের এবং নীতি-নির্ধারণের ফলে বাড়ছে কর্মচ্যুতি, এইসব অমানবিক কাজের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা কিনা হলেন এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল?

এখানে স্মরণ করা যায় বিশ্বের নানান দেশে—ফ্রান্স, জার্মানি, জাপানে যখন বিভিন্ন দশকে সেইসব দেশের আধুনিকিকরণের নামে, শিল্পায়নের নামে নতুন শিল্পনীতি সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সময় পাশাপাশি ঘটেছে শ্রমিকদের সামাজিকভাবে কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির ভাঙন, গড়ে উঠেছে প্রকল্প-ভিত্তিক ইউনিয়ন তথা কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়ন। আমাদের দেশেও সরকারের আর্থিক নীতির ও শিল্পনীতির আগমন ঘটেছে যার ফলে ঘটবে ব্যাপক বেকারী, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, গরীবি আর তার বিরুদ্ধে ইতিহাসের নিয়মেই গড়ে উঠবে ফলে কারখানায় সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। দীর্ঘদিন ধরে মালিক ও সরকারের দ্বারা অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার ঘটনাই শুধু ঘটেনি অনেক অমানবিক ঘটনার সাক্ষীও হয়ে রয়েছে এই সময়। শ্রমিক সংগঠন, রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংগঠন—এগুলো কিছু সাইনবোর্ড। ভার আছে ধার নেই। অবস্থার দোহাই দিয়ে শুধু শ্রমিকদের আত্মসমর্পণ, ত্যাগ স্বীকার করার উপদেশ আছে। বিকল্পের সন্ধানে লড়াই, সংগ্রাম নেই। এই অবস্থায় নেতৃত্ব বিশ্বাস হারিয়েছে, সংগঠন বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়েছে, আন্দোলনও মজদুরদের আস্থা হারিয়েছে। হয়ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অনেক সদস্য বেড়েছে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের মর্যাদা পেতে কোনো কোনো সংগঠন সারাভারতে সরকারি হিসেবে স্থান বিচারে এগিয়ে গেছে। কিন্তু একথা বোধহয় কেউই আমরা অস্বীকার করতে পারব না গত এক দশকে শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলো যেভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি। কেন আন্দোলন হল না, কেন আক্রান্ত শ্রমিক প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে অনুপস্থিত রইল, এ নিয়ে অনেক সাফাই, অনেক মূল্যায়ন, অনেক মতামত আছে তবু ঘটনা এটাই, সংখ্যার বিচারে রেজিষ্টার্ড শক্তিমানের দল বঞ্চিত, কর্মচ্যুত, অধিকারচ্যুত মজুরকে রক্ষা করতে পারেনি, পারছে না।

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিশেষ করে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তার কারণ তারা মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করে শ্রমিকদের আর্থিক কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে পেরেছিল, যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে শ্রমিকদের চেতনা বৃদ্ধি করে সামাজিক লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করবে এই দাবী ছিল। এসব তাঁরা বলতেন, আজও বলেন, তবে এখন জোরটা অনেক কমে গেছে। সেই চেতনা তাঁরা এখন অধিকাংশ শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পান না,

তাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও শ্রমিককে সংগঠন-বহির্ভূতভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এসব তত্ত্ব তাঁরা প্রচার করছেন। একই সাথে দু দুটো দশক ধরে অন্ততঃ এই রাজ্যে শ্রমিক তথা অন্য মানুষদের সমর্থনে ক্ষমতায় থাকা রাজ্য সরকার যে উন্নত চেতনার ফল সে কথাও মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। এটা ঠিকই, কংগ্রেস সরকার বিরোধী নানান আন্দোলনের ফলে এ রাজ্যে তদানীন্তন বিরোধী দলগুলো সরকারি ক্ষমতায় এল। শ্রমজীবী মানুষ, কলকারখানার শ্রমিক আশা করলেন, আমাদের নেতারা এবার শাসকদলের মন্ত্রী এম এল এ, তবে এবার মালিকদের জব্দ করা যাবে। অনেক প্রত্যাশা ছিল। পরে নেতাদের কাছ থেকে দিন দিন 'বাস্তববাদী' হওয়ার শিক্ষা পেলেন। শুনলেন সীমিত ক্ষমতার কথা। তখনও প্রতিশ্রুতি থাকল, কোথাও কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। এবার কলকারখানায় শ্রমিকরা আন্দোলনের কর্মসূচী চাইলেন. তখন শুনলেন এখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার দল সচেষ্ট সরকার ফেলে দিতে, তাই আইনশৃঙ্খলার সংকট সৃষ্টি হয় এমন কোনো সুযোগ ওদের দেওয়া যাবে না। ফলে আন্দোলন নেই, কারখানার মজদুরদের ওপর মালিকের চাপ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকল; এক ধরণের মালিক কোনো আইন-কানুন মানতে বাধ্য নন এমন আচরণ শুরু করলেন। শ্রমিকরা সরকারের কাছে দিনের পর দিন আবেদন, নিবেদন করলেন, কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না। সরকার যে আছেন ভুক্তভোগী জনগণ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছে না। কারখানায় শ্রমিকরা যখন জানতে চাইছেন পি এফ-এর টাকা জমা পড়ছেনা কেন? ই এস আই-এর টাকা কেটে নেওয়া সত্বেও জমা না দেওয়ায় আর্থিক সুবিধা ও চিকিৎসা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন কেন? মজুরী কম নিতে বলা হচ্ছে কেন? অবসরের পর মজুররা গ্রাচুইটির টাকা পাচ্ছেন না কেন? মজুরদের আইনী অধিকারগুলো খর্ব করা হয় এমন চুক্তিতে সই করা হচ্ছে কেন? —উত্তর বেশীর ভাগ জায়গায় নেই। উল্টে ইউনিয়নের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের তরফে আছে ভয়, ভীতি, সন্ত্রাস, আতঙ্ক। নির্বাচন এলেই জানা যায় বাহাত্তরের সন্ত্রাসের কথা। আজ যাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন, শিল্পাঞ্চলে সেই সময় শ্রমিকরা অনেক বেশী সন্ত্রস্ত থাকতেন কারখানার বাইরে। কারখানার ভেতরটা ছিল তুলনামূলক নিরাপদ। আর আজ কারখানার অভ্যন্তরেই শ্রমিকরা অনেক বেশী সন্ত্রস্ত থাকেন।

শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার শুরুতে শ্রমিকের আর্থিক দাবীর স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ার পাশাপাশি লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা ছিল, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তার দাবী। না, অনেককাল আর এসব দাবীতে নেই মিটিং, মিছিল, শ্লোগান। এখন শুধু কিছু চুক্তি আছে, কিছু নেতা শুধু সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বেঁচে আছে। কারখানায় একাধিক ইউনিয়ন আছে, কারুর কারুর কয়েকতলা সাইনবোর্ড লাগানো অফিস আছে, বছর বছর রেজিষ্ট্রেশন-এর রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য একদল পদাধিকারী আছে—যাদের নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম নেই। শ্রমিকের অর্জিত অধিকারগুলো রক্ষায় ও সামাজিক অধিকার অর্জনের জন্য ইউনিয়ন, অফিস, সভাপতি, উপদেষ্টা, বন্ধু সরকার এসব পরিকাঠামো আছে। মজুরের বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। এই অবস্থায় ভাঙনই তো অনিবার্য ছিল। তাই অসংখ্য মজুর ভাঙছেন, পরিত্যাগ করছেন এইসব নেতৃত্ব ও সংগঠনকে। গড়ে উঠছে কোম্পানী-ভিত্তিক, প্রকল্প-ভিত্তিক অসংখ্য সংগঠন এবং উদ্যোগ। এই ভাঙন তাই ইতিবাচক, সদর্থক, সঠিক। তবে এই মজদুর সংগঠন ও উদ্যোগ কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ দাবীতে আটকে থাকলে অর্জিত আইনী অধিকার রক্ষা করা যাবে না, সামাজিক ক্ষমতাও শ্রমিকরা পাবেন না। এই উদ্যোগ, এই প্রকল্প-ভিত্তিক ইউনিয়ন এবং কোম্পানী-ভিত্তিক ইউনিয়নে ব্যাপক শ্রমিকের ঐক্যের যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার না করলে খণ্ড-খণ্ড এই উদ্যোগ ভাঙনের হাতিয়ার হবে—নির্মাণের ইতিহাস হবে না।

□ নব দত্ত

[এই লেখাটি আলোচনার আকারে এখানে রাখা হল। এ বিষয়ে যে কেউ মতামত পাঠাতে পারেন নাগরিক মঞ্চের ঠিকানায়। প্রয়োজনে মঞ্চ সংবাদের পরবর্তী সংখ্যায় তা ছাপা হতে পারে।]

শোক সংবাদ

গত ২২ অক্টোবর '৯৪ পানিহাটি পুরসভার কমিশনার **শ্রীদীপেন সমাদ্দার**-এর মৃত্যুতে নাগরিক মঞ্চের সদস্য-বন্ধুরা মর্মাহত। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন আমাদের সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু। পানিহাটি শ্রমিক সমন্বয় কমিটি এবং পানিহাটি নাগরিক কমিটির তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

ক্যালকাটা মেগাসিটি প্রোগ্রাম

পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই প্রকল্পে দুটো দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে—

(১) শহরের সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পেছিয়ে পড়া মানুষের, অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো—যেমন পানীয় জলের সরবরাহ বা নোংরা জল নিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থা তৈরী করা বা উন্নতি করা।

(২) অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন নতুন রাস্তা, ট্রাক টার্মিনাল ও পাইকারী বাজার, বাণিজ্যিক ও বিপণন কেন্দ্র ইত্যাদি তৈরী করা।

কোন ধরণের কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং সেই সব খাতে কত খরচ করা হবে তা এক নজরে এই রকম :

প্রকল্প	কোটি টাকায়
১) পানীয় জল	২৩৫
২) নোংরা জল নিষ্কাশন	২৪৮
৩) কঠিন বর্জ্য-পদার্থ সংক্রান্ত	৩৮
৪) যানবাহন চলাচল ও পরিবহন	২৩৪
৫) বস্তি উন্নয়ন	২৭
৬) নতুন অঞ্চল উন্নয়ন ও আবাসন	৫৮০
৭) সাংস্কৃতিক, আমোদ-প্রমোদ ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন	১৭৭
৮) পরিবেশের উন্নতি ও পুনরুদ্ধার	৩১
মোট	১,৬০০

টাকা জোগাড় হবে এই ভাবে—

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ বাজেটারী সাহায্য (স্পেশাল বাজেটারী অ্যাসিস্ট্যান্স)	৪০০ কোটি টাকা
রাজ্য সরকারী সাহায্য (প্ল্যান অ্যাসিস্ট্যান্স)	৪০০ " "
অর্থনৈতিক সংস্থা থেকে (ইনস্টিটিউশানাল ফিনান্স)	৮০০ " "
মোট—	১,৬০০ " "

কয়েকটা প্রকল্প এমনই যেগুলোতে খরচ অনেক করা হলেও কোনোভাবেই সে টাকা তোলার চেষ্টা করা হবে না। যেমন নোংরা জল নিষ্কাশণ ব্যবস্থা বা কঠিন বর্জ্য-পদার্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা। অন্য কয়েকটা প্রকল্প যেমন পানীয় জল সরবরাহ, পরিবহন বা বস্তি উন্নয়নে খরচ করা টাকার কিছুটা কী বা কর ইত্যাদি বাবদ তোলা হবে। পাশাপাশি আবাসন, ব্যবসায়িক বা বিপণন কেন্দ্রের মতন প্রকল্পগুলোতে খরচ করা টাকা পুরোটাই যে উঠে আসবে তাই নয়, এমনকি উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হবে।

মেগাসিটি প্রোগ্রামের সমন্বয় ও নজরদারী করার ক্ষমতা থাকবে সি এম ডি এ-র হাতে।

আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য :

(১) মেগাসিটি প্রোগ্রামের আওতায় আসার কথা কলকাতা ও হাওড়া সহ ৩টে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৩১টা মিউনিসিপ্যালিটি, ৩টে নোটিফাইড এরিয়া ও ২২টা পঞ্চায়েত সমিতি।

(২) ১,৩৮০ বর্গ কিলোমিটার এই অঞ্চলে বসবাস করেন প্রায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মানুষ। এর ৪৩'৯ লক্ষ কলকাতায়, ৯'৫ লক্ষ হাওড়ায়, ৪২'৬ লক্ষ অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি ও বাকি ২২'৬ লক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির আওতাভুক্ত অঞ্চলে বসবাস করেন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষ (১৯৯১) মানুষের ২৭'৩৯ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৮৬ লক্ষ শহরাঞ্চলে মানুষ বসবাস করেন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৪'৪৫ শতাংশ মানুষ শহরে থাকতেন।

(৪) প্রস্তাবিত কলকাতা মেগাসিটির আওতাভুক্ত অঞ্চলে '৯১-এর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার 'শহুরে' জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ বাস করে। '৬১, '৭১ ও '৮১ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৭, ৭৫ ও ৬৯ শতাংশ।

(৫) ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৭-৭৮র মধ্যে ক্যালকাটা আরবান ডেভলপমেণ্ট প্রজেক্ট বা সি ইউ ডি পি (I) ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮২-৮৩র মধ্যে সি ইউ ডি পি (II) এবং ১৯৮৩-৯২র মধ্যে সি ইউ ডি পি (III) নামক প্রকল্পগুলো সি এম ডি এ রূপায়ন করেছে। এই তিনটি প্রকল্পে শুধু বিশ্বব্যাঙ্ক থেকেই নেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার মতন।

(৬) ১৯৯১-এর হিসেব অনুযায়ী শেষ দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৪'৫৫ শতাংশ যে সময়ে শহরে থাকা মানুষের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৮'৮৬ শতাংশ।

(৭) মেগাসিটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চলে ৪০ শতাংশ জমিতে আছে বসত বাড়ি, ৮ শতাংশ জমিতে আছে কারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, নানান স্কুল-কলেজ-অফিস-বাড়ি ইত্যাদি, ৮ শতাংশ জায়গায় রাস্তাঘাট ইত্যাদি ও ১ শতাংশ জমিতে পার্ক বা খেলার মাঠ। বাকি ৪৩ শতাংশ জমি ফাঁকা আছে যার মধ্যে পড়ে জলাভূমি, কৃষি জমি, গাছপালা, ইত্যাদি।

(৮) প্রকল্প অনুযায়ী, যে ৪৩ শতাংশ ফাঁকা জমি আছে তা কোনোমতেই শতকরা ৩৩ ভাগের কম হতে দেওয়া হবে না।

(৯) পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, বন্দর, বিমানবন্দর ইত্যাদি এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়নি।

(১০) প্রকল্পে আছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বুজিয়ে আগের মতন শহরকে বাড়ানো হবে না কারণ তাতে পরিবেশের ক্ষতি হবে।

এক নজরে প্রস্তাব

(১) পরিবেশের উন্নতি ও পুনরুদ্ধার

ক) শহরে সবুজায়ন, ভূদৃশ্য অনুযায়ী গাছ লাগানো, পার্ক, বাগান বা খোলা জায়গা তৈরী করতে ১০ কোটি।

খ) বর্জ্য-পদার্থের পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্পে ৫ কোটি।

গ) নদী বা জলাশয় তীরবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নে ১০ কোটি।

ঘ) কয়লার উনুনের পরিবর্তে গ্যাস বা ধোঁয়াহীন উনুন সংক্রান্ত প্রকল্পে ২ কোটি।

ঙ) বায়ু, জল, ও শব্দ দূষণ রোধে ২'৫ কোটি।

চ) ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ মাপা ও রোধ করায় ১ কোটি।

ছ) পরিবেশ সংক্রান্ত নজরদারী ও শিক্ষণের জন্যে ৫০ লক্ষ।

(২) পানীয় জল

ক) নতুন জল-পরিশোধনের সরঞ্জাম তৈরী হবে পলতা (৩১ কোটি), গার্ডেনরীচ (৪৬ কোটি) ও হাওড়ায় (৩১ কোটি)।

খ) জলাধার ও পাম্পিং স্টেশন তৈরী হবে বেহালা চৌরাস্তা (৬ কোটি); টালা, পলতা, গার্ডেনরীচ ও হাওড়াতে (৯ কোটি); অন্যান্য জায়গায় (১৫ কোটি) এবং উন্নতি করা হবে টালা ও অকল্যাণ্ড স্কোয়ার-এ (১ কোটি)।

গ) নানান মাপের মোট ২৬ কিলোমিটার নতুন জলের পাইপ বসানো (২০ কোটি); টালা থেকে পলতার ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রধান পাইপ বদলানো (২০ কোটি); অন্যান্য বড়সড় পাইপ লাইন মেরামতে ২০ কোটি; বাকি ছোট ও মাঝারি পাইপ নতুন ভাবে বসানো ও সারানোর জন্যে ২৪ কোটি।

ঘ) ১১০টা নতুন ডীপ টিউবওয়েল (৫ কোটি) এবং ২,০০০ নতুন চাপা কল (৫ কোটি)।

ঙ) পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্যে গবেষণা (১ কোটি)।

(৩) নোংরা জল নিষ্কাশন

ক) নোংরা জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন খাল কাটা ও পাম্পিং স্টেশন তৈরী করা এবং টালিগঞ্জ পঞ্চানন গ্রাম খালের নতুন রূপ দেওয়া ইত্যাদি (১২৫ কোটি)।

খ) কলকাতা আউটফল, বাগজোলা, কেষ্টপুর, ভাঙড়, কাটাখাল, সার্কুলার ও বেলেঘাটা খাল, টালির নালা, মনিখালি ও চুড়িয়াল খাল, হাওড়া ও ডানকুনি খাল ইত্যাদি নতুন করে সারানোর জন্যে ১৫ কোটি।

গ) বেশী জল জমে এমন জায়গায় নতুন নিকাশী ব্যবস্থা করা (১০ কোটি); নতুন নিকাশী পাইপ বসানো (৫ কোটি); প্রধান নিকাশী পাইপ ইত্যাদি সারানো (৩০ কোটি); কাঁচা নর্দমা নতুন তৈরী করা ও সারানো (১০ কোটি)।

ঘ) মানিকতলায় নতুন পাম্পিং ষ্টেশন তৈরী করা (৬ কোটি); সব কটা পাম্পিং স্টেশন সারানোর ব্যবস্থা করা (২ কোটি)।

ঙ) অন্যান্য পয়ঃপ্রণালী ও কাঁচা নর্দমা তৈরী করা ও সারানো (১০ কোটি)।

চ) স্যানিটারী শৌচাগার নির্মাণ (৫ কোটি)।

ছ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে সার্বজনীন শৌচাগার (১ কোটি)।

(৪) কঠিন বর্জ্য-পদার্থ সংক্রান্ত

ক) কঠিন বর্জ্য দিয়ে জমি ভরাট করার ব্যবস্থা ও তার জন্যে রাস্তাঘাট (১০ কোটি)।

খ) বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার, পুড়িয়ে ফেলা, সার তৈরী করা ইত্যাদি (৫ কোটি)।

৫) যানবাহন চলাচল ও পরিবহন

ক) কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, সল্টলেক বাইপাস, ব্যারাকপুর দমদম এক্সপ্রেসওয়ে, সাদার্ন এক্সপ্রেসওয়ে, গ্র্যাণ্ড ফোরশোর রোড (হাওড়া) ইত্যাদি নতুন রাস্তা তৈরী করা (৬০ কোটি মতন)।

খ) ই এম বাইপাস, রাসবিহারী কানেকটার, গড়িয়া কানেকটার, হাওড়া ড্রেনেজ খাল রোড ও ডিউক রোডের উন্নতি ও চওড়া করা (৩০ কোটি টাকা)।

গ) হুগলী নদীর ওপর নতুন সেতুর প্রাথমিক কাজ (২ কোটি টাকা)।

ঘ) পার্কসার্কাস কানেকটার-এ চার নং ব্রীজ চওড়া করা (৮'৫০ কোটি); গড়িয়াতে টালির নালার ওপর নতুন ব্রীজ (২'৫০ কোটি); ই এম বাইপাসে বাঘা যতীন রেল ষ্টেশনের কাছে ওভারব্রীজ (৮'৫০ কোটি); সালকিয়ায় ওভার ব্রীজ (৩ কোটি); উল্টোডাঙ্গা রেলব্রীজের তলায় রাস্তা (৪'৫০ কোটি)।

ঙ) নতুন হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে, শালিমার রেল স্টেশনের কাছে ও শেয়ালদা ষ্টেশনে তৈরী হবে তিনটে বাস

(এরপর ১১ পাতায়)

কলকাতায় বি আই এফ আর নাগরিক মঞ্চের চিঠি

গত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বি আই এফ আর-এর বেঞ্চ বসে। চেয়ারম্যানকে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয় যাতে মঞ্চের পরিচিতি দিয়ে জানানো হয় যে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের সহায়ক সংগঠন হিসেবে মঞ্চ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনী সাহায্য দিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় থাকার ফলে বন্ধ ও রুগ্ন কোম্পানী বা 'সিকা' আইনের বিভিন্ন গলদ ও ফাঁকফোকর (যার প্রতিফলন ঘটে বি আই এফ আর-এর নির্দেশেও) মঞ্চের নজরে আসে যা কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে আইনসভা-প্রশাসন-বিচার বিভাগকে জানানো হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

মঞ্চ আরো বলে যে বি আই এফ আর-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানের ভাষায়—'শিল্প রুগ্ন করা এক লাভজনক ব্যবসা'—তা সত্বেও সিকা আইনের ২৪নং ধারা প্রয়োগ করে মালিকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এমন কি বি আই এফ আর নিজেই বলেছে যে 'প্রতিটি রুগ্নতার ক্ষেত্রেই দায়িত্ব কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কিন্তু যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না।' নাগরিক মঞ্চ মনে করে যে আইনী বাধা নয়, ইচ্ছার অভাবই মূল কারণ। ১৯৯০ সালের ৭ এপ্রিল কলকাতায় এক শুনানীতে বি আই এফ আরের চেয়ারম্যানকে মঞ্চের তরফ থেকে ওপেক ইনোভেশন, নিউ টোব্যাকো কোম্পানী ও ইণ্ডিয়া মেশিনারীর কারখানার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'সিকা' আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনার মতো যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণসহ এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

চিঠির শেষে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে 'সিকা' আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী বি আই এফ আর-কে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার সদ্ব্যবহার করার দাবী জানানো হয়। আরো বলা হয় যে ওপরে বলা তিনটে কোম্পানী ছাড়াও টেক্সম্যাকো, মেটাল বক্স, অ্যাঙ্গাস জুট মিল, কানোরিয়া জুট মিল, ইস্টার্ণ পেপার মিল, কেলভিন জুট মিল ও বেঙ্গল ল্যাম্প এই কোম্পানীগুলোর বিষয়ে যা তথ্য মঞ্চের কাছে আছে তাতে ২৪ ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক-ভাবে কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করা যায়। বি আই এফ আর-এর যদি কোনো সদিচ্ছা থাকে দোষী কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দেবার, তবে মঞ্চ তাকে সব রকমে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

'রাজেশ্বর রাই দিবস' পালন

নাগরিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস বা 'রাজেশ্বর রাই দিবস' উপলক্ষ্যে গত ২১ সেপ্টেম্বর '৯৪, ধর্মতলায় মেট্রো সিনেমার সামনে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এইদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় (মঞ্চ সংবাদ ১৮-১৯ সংখ্যা) যাতে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে বাস্তবে কাজের বিরাট ফারাক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, মুখে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করলেও রাজ্য সরকার নিজের মালিকানাধীন অনেক সংস্থাই বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করেছে। ইস্কো'র ব্যাপারে কেন্দ্রের সমালোচনা করলেও একই ভাবে গ্রেট ইস্টার্ণ এক বিদেশী ব্যবসায়ীকে দিতে চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে অর্থ নেওয়ার কেন্দ্রীয় নীতির বিপক্ষে কথা বললেও নিজে বিদেশী বিভিন্ন অর্থ-সংস্থার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ৭,৫০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে—'৯৮ সালের মধ্যে নেবে আরো ১,১১৬ কোটি টাকা। এবং এই ঋণের সুদ দিতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষা, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প, শহরের নিকাশী ব্যবস্থা এইসব খাতে ২০০ কোটি টাকা খরচ কমাতে হয়েছে।

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষ থেকে এ দিনের সভায় অভিযোগ করা হয় যে রাজ্য সরকার এক সময়ে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য জীবন-ধারণের উপযোগী ভাতার দাবী জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু নিজে এখন তা দিচ্ছে না। অথচ কেন্দ্রের কাছ থেকে আনা কলকাতা সাজানোর জন্য ১,৮৬০ কোটি টাকার মধ্যে ৮০০ কোটি খরচ করা হচ্ছে উচ্চবিত্তদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করার জন্য। নীচের তলার মানুষের জন্য কিছুই বরাদ্দ হয়নি এই প্রকল্পে।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ট্যানারি বাঁচাও কমিটি, স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক বাঁচাও কমিটি, ইন্দো-জাপান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, সি ই এস সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, পানিহাটি শ্রমিক সমন্বয় কমিটি, বরানগর জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন, ভিক্টোরিয়া জুটমিলের প্রগেসিভ লেবার ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও কেলভিন জুট মিল, হনুমান জুট মিল, এন জে এম সি সহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

২৮টি শ্রমিক-কর্মচারীদের যুক্ত সংগঠন 'মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটিও এদিন আরেকটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে যাতে শ্রম ট্রাইবুনালের দীর্ঘসূত্রিতা; গ্র্যাচুইটি, পি এফ, ই এস আই প্রসঙ্গে; লক আউট, ক্লোজার, সাসপেনশন অব ওয়ার্ক সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীতির সমালোচনা করা হয়েছে।

□ ন্যাশনাল ট্যানারি

ন্যাশনাল ট্যানারি কারখানার আরও একজন শ্রমিক মাখন রাম খেতে না পেয়ে মারা গেলেন। এ পর্যন্ত ১৭ জন শ্রমিক মারা গেলেন। ৭ সেপ্টেম্বর '৯৪ কলকাতা হাইকোর্ট শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা ৫ সপ্তাহের (১২ অক্টোবর) মধ্যে বণ্টন করার রায় দিয়েছিল। শিল্প পুনর্গঠন মন্ত্রী বলেছিলেন, "পুজোর আগেই ন্যাশনাল ট্যানারির শ্রমিকরা টাকা পাবেন।" সংবাদ পেয়ে বিহার, ইউ পি থেকে ন্যাশনাল ট্যানারির প্রায় ১০০ জনের মতো শ্রমিক এসেছিলেন কারখানার গেটে। মাখন তাদেরই একজন। বাড়ি বিহারের মুজফ্ফরপুর। ন্যাশনাল ট্যানারির শ্রমিকরা ১২ তারিখের পর ১৫ দিন পেরোলেও টাকা পাননি। ফলে খোলা আকাশের নিচে শেষ সম্বলটুকু খরচা করা মাখন রাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৩ অক্টোবর তাকে গুরুতর অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ওই দিনই সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। বকেয়া না পাওয়া অন্য শ্রমিকরাও মাখন রামের মতো পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ হল রাজ্য সরকারের পক্ষে আরেক দফা আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে শ্রমিককে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়ার মত কাজের নিদর্শন। প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন নেতারা এবারও চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করছেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার কি করে কত তাড়াতাড়ি নিজেরই কেনা ন্যাশনাল ট্যানারিকে কোনো অন্য পুঁজিপতির হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজে কারখানা চালাতে ইচ্ছুক প্রোমোটার আহ্বান করে বিজ্ঞাপনের বয়ান তৈরী হয়ে প্রকাশের জন্য চলে গেছে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে।

অনেক টালবাহনার পর অবশেষে গত ১০ নভেম্বর '৯৪, দক্ষিণ পরগনার জেলাশাসকের এবং বিধায়ক ভদ্রেশ্বর মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকারের দেওয়া ১৫ লক্ষ টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল ন্যাশনাল ট্যানারির শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে। ঐদিন আলিপুর ট্রেজারী থেকে ২৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারির প্রত্যেককে ৩,৭৮৮ টাকা করে দেওয়া হয় যাদের কোম্পানী বন্ধ হবার আগের শেষ পে-রোলে নাম ছিল। ন্যাশনাল ট্যানারি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে ঐদিনই এক ডেপুটেশনে বাকিদেরও টাকা-পয়সা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবার দাবী জানানো হয়েছে। ট্রেজারীতে টাকা পাবার পর সিটুর লোকজন শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি চাঁদা তোলে বলে অভিযোগ।

[১০. ১১. ৯৪]

□ স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস

শ্রীরামপুরের স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালসকে দু টুকরো করে ১৯৮৩ সালে দেনার বোঝা মাথায় নিয়ে সম্পত্তিহীন হয়ে জন্ম নেওয়া এসপেক ইনোভেশন কারখানাকে গুটিয়ে দেওয়ার নির্দেশকেই বহাল রেখেছে বি আই এফ আরের অ্যাপিলেট অথরিটি (এ এ আই এফ আর)। তার আগে ১৪ মার্চ '৯৪ তারিখে পুরনো মালিক আম্বালাল সারাভাই গ্রুপ এবং প্রোমোটার আর বি চান্দাকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা পত্রের (এম ও ইউ) মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা প্রণব রায় এ এ আই এফ আর-কে জানান, আগ্রহী নতুন প্রোমোটারদের মধ্যে ও পি মল-কে স্কীম পেশ করার সুযোগ দেওয়া হোক। ১৪ সেপ্টেম্বরের শুনানীতে অ্যাপিলেট জানিয়ে দেয়, ১৯৮৭ সাল থেকে বি আই এফ আর-এ থাকা এসপেকের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। অ্যাপিলেটও এক বছর দিয়েছে। পুনরুজ্জীবনের কার্যকরী কোনো প্রকল্প না থাকায় গুটিয়ে দেওয়ার নির্দেশই বহাল রইল।

পূর্ব ভারতের একমাত্র পেনিসিলিন উৎপাদক স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-এর বিভাজন, পেনিসিলিন উৎপাদনে বেআইনী কাজ ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করে নাগরিক মঞ্চের করা পিটিশন এখনও এম আর টি পি সি-তে বিচারাধীন। জানা গেছে, রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের কর্তা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ওয়াইণ্ডিং আপকে স্থগিত রেখে ও পি মলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এ এ আই এফ আর-কে নির্দেশ দিতে আদালতে আবেদন জানাবে পূজোর ছুটির পর। এও জানা গেছে, ও পি মল চান্দাকের আত্মীয় আর তাই সরকার এ ব্যাপারে আশাবাদী। পৃথকভাবে এসপেক-এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয় একথা প্রথম থেকে নাগরিক মঞ্চ এবং স্ট্যাণ্ডার্ড এসপেক বাঁচাও কমিটি বলছিল। অ্যাপিলেটের সর্বশেষ শুনানীতে রাজ্য সরকারও একথা বলেছে। অথচ, ওয়াইণ্ডিং আপ নির্দেশের ফলে কেবল এসপেক ও তার শ্রমিকরাই বিপদে পড়বে, স্ট্যাণ্ডার্ড এর বাইরে থাকছে। অ্যাপিলেটে সরকার আরও বলেছে, চান্দাক-সারাভাই এম ও ইউ এখন আইনত গ্রাহ্য নয়।

এসপেক ও স্ট্যাণ্ডার্ডের যখন এই অবস্থা, তখন জানা গেছে, দেশে পেনিসিলিনের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। একারণে চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। জে কে ফার্মাকেম নামে এক সংস্থা তামিলনাড়ুর গুড্ডালোর-এ একটি পেনিসিলিনের কারখানা তৈরী করার আগে বাজার ও চাহিদা তথা উৎপাদনের অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিল টাটা কনসালটেন্সিকে। তাদের রিপোর্ট থেকেই

চাহিদা ও উৎপাদনের ফারাকটা জানা গেছে। এই টাটা কনসালটেন্সিকে দিয়েই স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক পুনরুজ্জীবনের স্কীম করিয়েছিল অপারেটিং এজেন্সি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা। তাদের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভারতে পেনিসিলিনের চাহিদা হবে ৪,৪০০ মেগা মিলিয়ন ইউনিট, যা ২০০০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৭,২০০ মেগা মিলিয়ন ইউনিট (এম এম ইউ)। জে কে ফার্মাকেমের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১,২৫০ মেগা মিলিয়ন ইউনিট। স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেকের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১,০০০ মেগা মিলিয়ন ইউনিট, যা ১৯৯১ থেকেই বন্ধ। এছাড়া দেশে এখনও যারা উৎপাদন করছে তার মধ্যে আছে হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস, আই ডি পি এল ও অ্যালেমবিক কেমিকেলস, যাদের উৎপাদন ক্ষমতা মোট ২,১০০ এম এম ইউ। এছাড়াও মার্কিনী টরেন্ট— এস পি আই সি এবং টরেন্ট-গুজরাট বায়োটেক নামে দুটি সংস্থা পেনিসিলিন উৎপাদনে নামতে চলেছে। জে কে ফার্মাকেম-এর সঙ্গে প্রযুক্তি সহযোগিতা মার্কিন কোম্পানী আই সি এনের, মোট ব্যয় ১৯৫ কোটি টাকা। আর্থিক সহযোগিতা দেবে তামিলনাড়ু শিল্প বিকাশ নিগম। অন্যদিকে, টাটা কনসালটেন্সির হিসেবে স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেকের পুনরুজ্জীবনে তিনবছরে লাগবে মাত্র ১০ কোটি টাকা। গ্যাট ও ডাঙ্কেল চুক্তির প্রকাশ্য-বিরোধী বাম সরকারের পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম কি এই সামান্য দায়িত্বটুকু নেওয়ার ক্ষমতা বা সদিচ্ছা রাখে? এ প্রশ্ন স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেকের ১,২০০ কর্মচারীরও মনের কথা। ইতিমধ্যে ২৪ অক্টোবর শ্রীরামপুর স্টেশনে স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক বাঁচাও কমিটি এবং বরানগর জুট মিল মজদুর কমিটি সারাদিন অবস্থান করে ও কারখানা দুটি চালু করার দাবী জানায়।

[৩. ১০. ৯৪]

□ বরানগর জুট মিল

বরানগর জুট মিলের শ্রমিকদের ৬টি ইউনিয়ন বি সি জৈন অ্যাণ্ড অ্যাসোশিয়েট্‌স-এর সঙ্গে কারখানা খোলার জন্য চুক্তি করলেন। এর মধ্যে রয়েছে মজদুর কমিটি, সিটু, ইউ টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, বি এম এস এবং স্টাফ ইউনিয়ন। অন্য দিকে আই এন টি ইউ সি চুক্তি করেছে চাঁপদানী ইণ্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে। ১ মে '৯৪ থেকে প্রায় ৮০০ অস্থায়ী সহ ৫,০০০ শ্রমিকের এই কারখানা বন্ধ। শ্রমিকদের ২৬ কোটি টাকা সহ কারখানার মোট বকেয়া ৪৩ কোটি টাকা। শুধু পি এফ এবং ই এস আই-র বকেয়া ১০ কোটির মতো। ১৭ মে রাজ্যের শ্রম কমিশন কারখানায় লকআউটকে বেআইনী ঘোষণা করতে বললেও সরকার করেনি। আদালত অবশ্য পরিচালক আর কে নিমানিকে খারিজ করেছে।

বরানগর কারখানার বিষয়টি এখন হাইকোর্টে বিচারাধীন। বি সি জৈনদের প্রস্তাবে রয়েছে সকলেই কাজ পাবে। পুরো বেতন পাবে। বকেয়া বোনাস ও বেতন পাবে ১৮ মাসে, কিস্তিতে। বকেয়া পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি বাবদ মাসে মাসে সোয়া ৪ লাখ টাকা দেওয়া হবে। কারখানা খোলার সময়ে শ্রমিকরা ৩০০ টাকা করে হাতে পাবে। অন্যদিকে চাঁপদানীর প্রস্তাবে ৫৮ বছর বয়সীদের অবসর এবং দুবছরের বকেয়া বোনাস ৩৬ মাসে শোধ করার প্রস্তাব ছিল। তাছাড়া কারখানার মালিকানার দাবীও রয়েছে, যা হাইকোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে। ৪৮ লাখ টাকা জমা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ মালিকদের এখন আদালতের অনুমতির জন্য লড়তে হবে।

[৩. ১০. ৯৪]

□ ইন্দো-জাপান স্টীল কোম্পানী

ইন্দো-জাপান স্টীল কোম্পানীর বিষয়ে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রকল্পের ওপর অপারেটিং এজেন্সির মতামত চেয়েছে বি আই এফ আরের অ্যাপিলেট অথরিটি। ১৯ অক্টোবর কোম্পানীর কর্তারা এ এ আই এফ আরে নতুন করে এককালীন বোঝাপড়ার প্রকল্প (ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট) জমা দেন। আগের শুনানীতে তাদের এই নির্দেশ দেয় অ্যাপিলেট অথরিটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোম্পানী কর্তৃপক্ষের পেশ করা আগের স্কীম খারিজ করে কারখানাকে ওয়াইণ্ডিং আপ করার বা কারখানা গুটানোর নির্দেশ দিয়েছিল বি আই এফ আর। অ্যাপিলেট অথরিটি সেই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে নতুন করে স্কীম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। শুনানীতে ইন্দো-জাপান স্টীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। উল্লেখ্য, এ এ আই এফ আর ইন্দোজাপান স্টীল কর্তৃপক্ষকে পুনরুজ্জীবন প্রকল্প পেশের জন্য বলেছিল, তার বদলে কর্তৃপক্ষ দিয়েছে এককালীন বোঝাপড়ার প্রকল্প (ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট)।

[৩. ১০. ৯৪]

ক্যালকাটা মেগাসিটি প্রোগ্রাম

(আট পাতার পর)

টার্মিনাস এবং বিদ্যাসাগর সেতুর কলকাতার ও হাওড়ার দিকে তৈরী হবে ছুটো দূর পাল্লার বাস টার্মিনাস। প্রতিটার জন্যে খরচ হবে ২ কোটি টাকা করে।

চ) ট্রাক টার্মিনাল ও পাইকারী বাজার তৈরী হবে হাওড়ায় কোনাতে (১০ কোটি), এবং ডানকুনি (৫ কোটি), বিরাটি-মধ্যমগ্রাম (৫ কোটি) ও গড়িয়া-সোনারপুর রোডে (৫ কোটি)।

ছ) ২০টা ফেরীঘাট তৈরী করা বা সারানো হবে ৫ কোটি টাকায় এবং সেগুলোতে যাওয়ার রাস্তার উন্নতি করা হবে ৫ কোটি টাকা দিয়ে।

(৬) নতুন অঞ্চল উন্নয়ন ও আবাসন

ক) ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে ১,৫০০ হেক্টর জমিতে আবাসন করার পরিকল্পনা নিয়ে যেসব অঞ্চলের উন্নয়ন করা হবে—কল্যাণী গয়েশপুর (১০০ হেক্টর); হালিশহর দেউলপাড়া-কাঁচড়াপাড়া (৫০ হেক্টর) ভাটপাড়া-উত্তর ব্যারাকপুর (৫০ হেক্টর); বারাসাত-নবপল্লী (৩৫০ হেক্টর); চুঁচুড়া-চন্দননগর-ভদ্রেশ্বর (৩০০ হেক্টর); বালি-ডানকুনি (২০০ হেক্টর); পশ্চিম হাওড়া (২০০ হেক্টর); সাঁকরাইল-আবাদা (১০০ হেক্টর); উলুবেড়িয়া (১০০ হেক্টর) ও কলকাতার পূর্বদিক (৫০ হেক্টর)।

খ) সব আয়ের মানুষের জন্যে আবাসন (১৫০ কোটি টাকা)।

(৭) সংস্কৃতি, আমোদ প্রমোদ ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন

ক) বারাসাত, উলুবেড়িয়া ও চুঁচুড়ায় ৬ কোটি টাকায় তৈরী হবে তিনটে সংস্কৃতিক কেন্দ্র।

খ) কলকাতায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও স্থায়ী মেলা প্রাঙ্গণ তৈরী হবে (৩০ কোটি)।

গ) আমোদ প্রমোদ কেন্দ্র (১৬ কোটি)।

ঘ) বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও বাজার তৈরী হবে ১২০ কোটি টাকা খরচে—নিউ মার্কেট, কলেজ স্ট্রিট, লেক রোড, ল্যান্সডাউন, পার্কসার্কাস, উল্টোডাঙ্গা, স্যার চার্লস এ্যালেন ও মানিকতলা মার্কেটে।

নাগরিক মঞ্চ-র
বার্ষিক সাধারণ সভা

* ২৭ নভেম্বর '৯৪, রবিবার
* সকাল ৯'টা
* বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী

নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনা

* আক্রান্ত শ্রমিক '৯৪	৪০'০০ টাকা
* ইস্কো ঃ বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা	৩'০০ টাকা
* বি আই এফ আর সম্পর্কে জানার কথা	৪'০০ টাকা
* ই এস আই (বাংলা/হিন্দি)	৩'০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ নাগরিক মঞ্চ দপ্তর, কলিকাতা-৮৫।
বুক মার্ক, কলেজ স্ট্রীট।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫ (ফোন ঃ ৩৫০-৮৪১২) হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং পার্বালিসিটি ১১৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯ (ফোন ঃ ৩৫০-৭৯৬৭) হইতে মুদ্রিত।